# জীবনযাপন

## জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা ও সম্পাদনা

গৌতম মিত্র

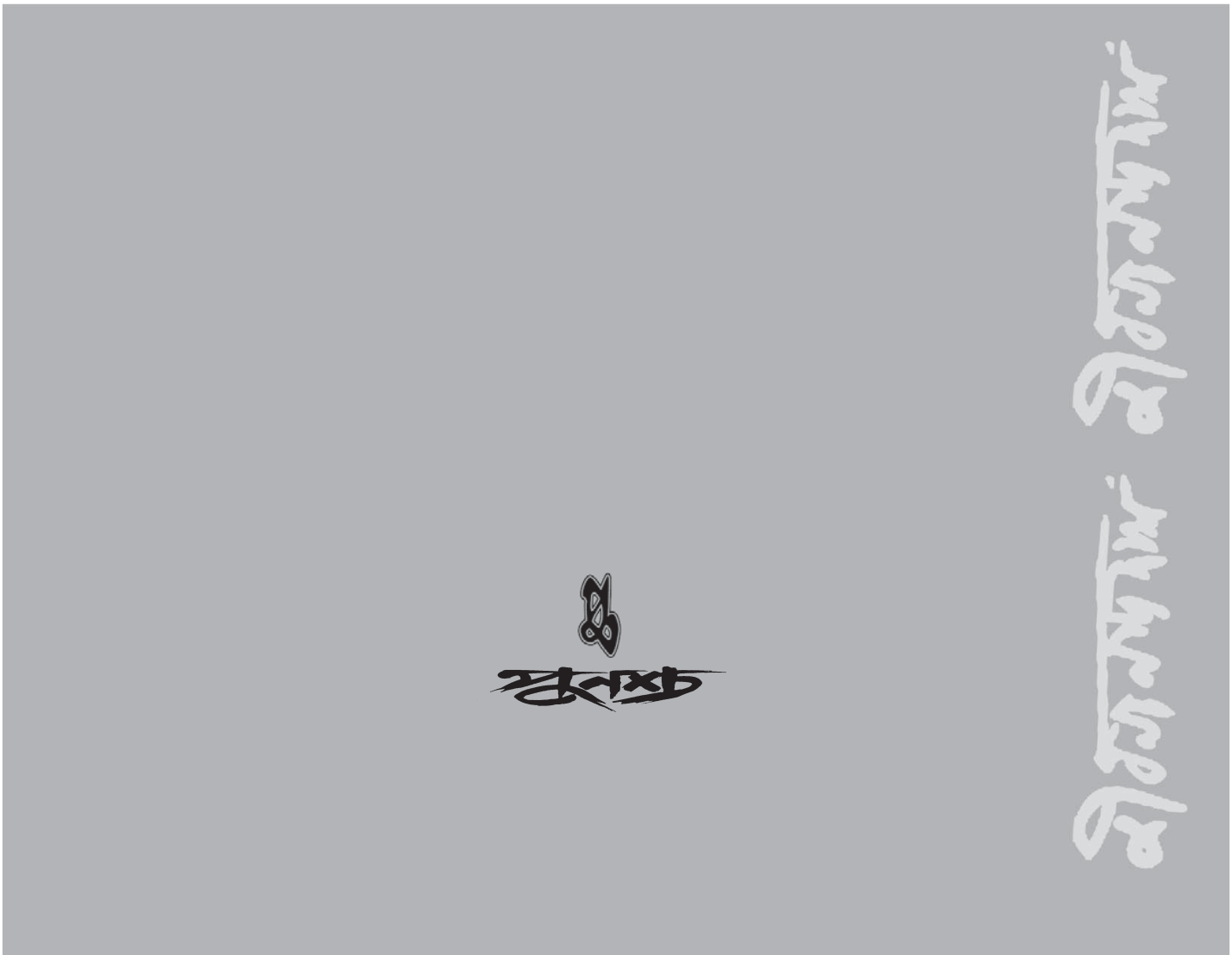

পুনশ্চ

JIBONJAPAN
*A Bengali Novel by Jibanananda Das*
Edited By Gautam Mitra

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-386-7

Price r 250

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আর্ট ক্রিয়েশন

দাম r ২৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন -৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

# ভূমিকা

প্রথমেই বলি ‘জীবনযাপন’ নামে ভূমেন্দ্র গুহর সম্পাদনায় ‘বিভাব’ ১৯৯৮-এ যে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল তা অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে আমি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শ্রীমতী রত্না রায়ের কাছ থেকে এই উপন্যাসটির বাকি পাণ্ডুলিপিগুলো ও দুটি অপ্রকাশিত  কবিতা খাতার পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করি এবং ভূমেন্দ্র গুহর হাতে অর্পণ করি। শ্রীমতী রত্নাদেবীর বাবা অশোকচন্দ্র গুপ্ত জীবনানন্দ দাশের বন্ধু ছিলেন। অশোক গুপ্তর বাবা কাকা জ্যাঠার বরিশালের বাড়িতেই জীবনানন্দ দাশের জন্ম। রত্নাদেবীকে জীবনানন্দ কিছুদিন পড়িয়েছেনও। জীবনানন্দ কন্যা মঞ্জুশ্রীর বন্ধু ছিলেন রত্না দেবী। মঞ্জুশ্রীই পাণ্ডুলিপিগুলো রত্নাদেবীর কাছে রেখেছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য যে কবিতার কপি রাখলেও উপন্যাসটির কপি করিনি। পরে উপন্যাসটির সম্পূর্ণ পাঠ একটি দৈনিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ‘জীবনের উপকরণ’ নামে প্রকাশিত হয়। ‘প্রতিক্ষণ’ জীবনানন্দ সমগ্র জন্মশতবর্ষ সংস্করণের চতুর্থ খণ্ড, ২০০৩-এ তা পুনর্মুদ্রিত করে। আমরাও পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠটি গ্রহণ করেছি। জীবনানন্দ নিজে উপন্যাসের কোনও নামকরণ না করলেও, প্রকাশের সময় একই উপন্যাসকে ভূমেন্দ্র গুহ দুরকম নামকরণ করেছেন। ‘জীবনযাপন’ ও ‘জীবনের উপকরণ’। আমার কাছে ‘জীবনযাপন’ নামটি যথার্থ মনে হয়েছে তাই উপন্যাসটি এই নামেই প্রকাশিত হচ্ছে। ‘যাপন’-এর মধ্যে যে প্রবাহ থাকে উপকরণে তা নেই। উপন্যাসটি তো প্রবাহের কথাই বলে, জীবনের নাটকযাপন, বিভিন্ন চরিত্র এখানে প্রবাহের আবহেই তাদের সংলাপ বলে।

জীবনানন্দ দাশ নাটক নিয়ে খুব গভীরভাবে ভেবেছেন। আমরা জীবনানন্দের ডায়েরি ও গল্প-উপন্যাসের সূত্রে বিভিন্নসময় বিভিন্নরকম ভাবে নাটক বিষয়টির উল্লেখ পাই। যেমন অবিনাশ সাহিত্য থিয়েটার, ট্যানার-ফ্যানার, বার্নার্ড শ’, মনোমোহন সান্ধ্য সাহিত্য, শিশির ভাদুড়ি, শেক্সপিয়র ইত্যাদি। আমরা দেখি বুদ্ধদেব বসুর লেখা নাটক যখন মঞ্চস্থ হচ্ছে, জীবনানন্দ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মধ্যেও আমরা নাটকের লক্ষণ দেখতে পাই। বিশেষত ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটি তো একটি সফল নাটক  হয়ে উঠতে পারে।

পরবর্তীকালে কেউ কেউ জীবনানন্দ দাশের গল্প উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়েছেনও। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'কারুবাসনা' ও 'মাল্যবান'-এর কথা।

এই সব কারণেই 'জীবনযাপন' উপন্যাসটি জীবনানন্দ দাশের একটি ব্যতিক্রমী রচনা।এখানে জীবনানন্দ দাশ নাটকের সমস্যা, দর্শন ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। নাটকের বাইরের বিষয়ে একটি কথাও তিনি এই উপন্যাসে লেখেননি। খুবই সংক্ষিপ্ত এই উপন্যাসের পরিসর। মাত্র তিনটি পটভূমি। প্রথমটি নায়ক অজিতের সঙ্গে, অজিতের রাঙাখুড়ো তারকবাবুর সংলাপ। তারকবাবু 'নাটক'-কে কী চোখে দেখেন তার আভাস এই সংলাপে পাওয়া যাবে:

"—অজিত, তুমি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে নামলে?

অজিত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হয়ে তারকবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল

তারকবাবু বল্লেন তোমার বাবার কথা কি তুমি একটুও মনে কর নি?

অজিত কোনো কথা বল্লে না।

—তোমার মাকেও ভুলে গিয়েছিলে?

অজিত কোনো উত্তর দিল না।

—তোমার মা সেই ছেলেবেলা থেকে কত যত্ন করে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন-

অজিত বল্লে—রাঙাখুড়ো—

তারকবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন- তারপর বি-এ পাশ করলে- এম-এ পাশ করলে—

—হ্যাঁ

তোমার চরিত্র তোমার বাপের মত মর্য্যাদা পেল-অন্ততঃ আমরা তাই ভেবেছিলাম

—অনেক দিন অব্দি ভেবেছিলাম কিন্তু তোমার যত অধঃপতন হোক না কেন-এ সব

দিকে যে তুমি আসবে কোনোদিন এ কথা তো আমরা কল্পনাও করতে পারি নি—

অজিত বল্লে এসে পড়লাম

এসে পড়লে? থিয়েটারে? মহিমের ছেলে হয়ে?

তারকবাবু বল্লেন—তোমাদের পরিবারকে আমি চিরজীবন ধরে এমন শ্রদ্ধা করে

এসেছি অজিত। এ পরিবার বামুন বা কায়েত বা কোনো সদ্বংশজাত হিন্দু পরিবার বলেই নয়

কিন্তু এর মনুষ্যত্বের জন্য। তোমার ঠাকুর্দ্দা আমার বন্ধু ছিলেন তামাকটি অব্দি ছুঁতেন না কোনো দিন কোনো মজলিস মুজরোয় তাঁকে দেখি নি সঙ্কীর্তন ছাড়া অন্য কোনো গান তাঁর অত্যন্ত উপেক্ষার জিনিষ ছিল রকম প্রেমই তিনি কোনো দিন স্বীকার করতেন না। মেয়েমানুষের শরীরের কোনো রকম ব্যাখ্যাও কেউই কোনো দিন তাঁর কাছে করতে সাহস পেত না, পরস্ত্রীর দিকে তিনি ভুলেও কোনো দিন

তাকাতে যেতেন না,—অথচ উদার হৃদয়ের কত সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী মানুষ মানুষ—তোমার বাবাও তো ঠিক তাঁরই মত সব বিষয়েই তোমার ঠাকুর্দ্দার মত।

একটু থেমে তারকবাবু বল্লেন আমি ভেবে পাই না তাঁদের বংশের সন্তান হয়ে তোমার বাপমায়ের হাতে চরিত্র গড়ে কি করে তোমার এ রকম অবস্থা হ'ল—

তারকবাবু হতভম্ব হয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।"

অজিতের উত্তরের মধ্যে যেন জীবনানন্দের কণ্ঠস্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়। নাটক নিয়ে অজিতের বক্তব্য:

"...থিয়েটারে যে নেমেছি রাঙাখুড়ো অনেক জিনিষই আমি চাই— যে সব বই জীবন সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ, যে সব কলম বিধাতার কল্পনা বিচার বুদ্ধি দুর্বৃদ্ধি, সফলতা ব্যর্থতার নাড়ীর খবর সব চেয়ে গভীর ভাবে রাখে সে সব লেখা দিয়েই স্টেজ জমাতে চেষ্টা করব এখন, শুধু হৈ রৈ বা অবাস্তবতা দিয়ে নয়। এই একটা জিনিষ রাঙাখুড়ো। আর একটা হচ্ছে এই ষ্টেজের প্রতি লোকের বিরূপ বিরস ভাব আমি ঢের কমিয়ে আনতে চেষ্টা করব। আমি আস্তে আস্তে বোঝাব তাদের যে এই বইগুলো জীবনের পক্ষে যেমন মূল্যবান— এদের অভিনয়ও তেম্নি; শুধু তাই নয় —অভিনয়েরই একটা মূল্য আছে---একটা ঐশ্বর্য্যভরা কবিতা বা গান বা ছবির যে মূল্য দাও তোমরা তত দূরই।"

দ্বিতীয় পর্বটি অজিত ও পূর্ণিমার সংলাপ। পূর্ণিমা একজন সফল অভিনেত্রী। সুদর্শন ও সুশিক্ষিতা পুর্ণিমা মহাভারত নাটকে সত্যভামার পার্ট করে। অজিত জানায় প্রস্তুতির অভাব ও নাটক নির্বাচনের দৈন্যতায় পূর্ণিমার অভিনয় তার ভালো লাগেনি। পূর্ণিমা এতে কষ্ট পায়। এই অধ্যায়েও কিছু জরুরি কথা আছে। নাট্যজগতের অসুবিধের জায়গা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে:

"... অঙ্ক জ্যামিতি জ্যোতিষ বিজ্ঞান মীমাংসা ন্যায় এই সব নিয়ে যাদের প্রতিভা ফুটে উঠছে তারাও নটরাজের বন্ধু তারাও কবি কিন্তু মদ বা লম্বা চুলের প্রয়োজন তারা বোধ করে না আমরাই বা কেন বোধ করব? আমাদের এ আনুষঙ্গিকগুলোর কি প্রয়োজন আছে? কবিতা লিখতে গিয়ে, গান গাইতে গিয়ে কিম্বা অভিনয় করবার সময় ছবি আঁকবার সময় ব্রান্ডি ঝাকড়া চুল বা উচ্ছৃঙ্খলতার কি প্রয়োজন? কিন্তু আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই যে এক এক জন সত্যিকার কবি বা নাট্যপ্রতিভাও এ জিনিষগুলোকে তাদের অন্তরের জীবনের পক্ষেও এমন দরকার মনে করে।"

তৃতীয় অধ্যায়টি একজন এটর্নি-পুত্রের সঙ্গে অজিতের কথোপকথন। যে আবার পূর্ণিমাকে মনে মনে ভালোবাসে। প্রেম নিবেদন করতে চায়। অজিত তাকে বলে:

"...লেখ, কিম্বা স্টেজ-অ্যাক্টিং যদি পার—তাও কর—কিন্তু কিছুই যখন পার না তুমি তখন এই জিনিষটা কর—পূর্ণিমাকে ভালোবেসে অন্য কোনো রকম রস চরিতার্থতার কথা ভাবতে যেও না। সে একজন অভিনেত্রী—ষ্টেজে দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনের অনেক নিহিত সৌন্দর্য্য ও সম্পদকে অনুভব করতে সে তোমাদের সাহায্য করে। তোমরা যদি অনুভব করতে পার তাহলে সে কৃতার্থ হয়।

তেমন ভাবে অনুভব করতে পেরেছ—এবং সে অনুভবের মাধুর্য্য নিয়ে অনেক দুঃখ ও নিষ্ফলতার রাত একা একা মুগ্ধতায় কেটে যাবে তোমার এমন যদি বোধ কর তাহ'লে তোমার সমস্ত জীবনের এই সাধনাটুকুই পৃথিবীর কোনো অমূল্য জিনিষের চেয়েই কম মূল্যবান হবে না।"

এরপর আরও চরিত্র এসেছে কিন্তু বিষয় সেই নটকই। নাটককে কেন্দ্র করে জীবনের টুকরো যাপন একজায়গায় তুলে ধরেছেন। কাহিনি যতটা বাইরের দিকে গড়ায় তার থেকে অনেক বেশি ভেতর ভেতর প্রবাহ চলে। একটা আইডিয়াকে তিনি বাস্তবসম্মত রূপ দিতে চান। আমার মনে হয়েছে অজিতের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ শিশির ভাদুড়ির সময়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'জীবনযাপন' আমার কাছে দোসরহীন উপন্যাস হিসেবে থেকে যাবে। আর এখানেই উপন্যাসটি প্রকাশের সার্থকতা। 'বিভাব' পত্রিকায় প্রকাশকালে ভূমেন্দ্র গুহর ভূমিকাটি এখানে যুক্ত হল:

"আট-এর দশকের প্রথম দিকে যখন জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস-কবিতার পাণ্ডুলিপির এক্সারসাইজ খাতাগুলির প্রধান অংশ জাতীয় গ্রন্থাগারে চ'লে গেল, তখন পাণ্ডুলিপির খাতাগুলির যে-অংশটি মঞ্জুশ্রী দাশের কাছে থেকে গেল, তা জীবনানন্দের Literary Notes নামে চিহ্নিত 'দিনলিপি'র, কিছু প্রকাশিত লেখার এবং কিছু খুচরো কাগজপত্রের লেখার ও চিঠির খসড়া বা কপির, দলিলের, রসিদের ইত্যাদির। সেই রকমই হবে ব'লে মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে কাকা অশোকানন্দের বোঝাপড়া হয়েছিল; দিনলিপিগুলি অপ্রকাশ্য বিবেচিত হয়েছিল, কেননা তাতে অনেক পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে, যেগুলি (তখনই প্রকাশিত হলে) অস্বস্তির কারণ হতে পারে। মঞ্জুশ্রী প্রাথমিক ভাবে আঁচ করতে পারেন নি যে, জীবনানন্দের গদ্য লেখাগুলি একদিন বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে; অশোকানন্দ হয়তো করেছিলেন করেছিলেন ব'লে চেয়েছিলেন যে, গৃহপরিবেশের নানা প্রকার ইগোর টানাপোড়েনে এবং সংরক্ষণের অব্যবস্থায় পাণ্ডুলিপিগুলি যেন নষ্ট হয়ে না যায়, আর সেই জন্যে তারা বরং জাতীয় গ্রন্থাগারেই থাক: ব্যাপারটা ঘটিয়ে তোলা খুব সহজ ছিল না, দুরারাধ্য প্রয়াসের প্রয়োজন পড়েছিল।

আমরা যারা পঞ্চাশে-যাটে তরুণ ছিলুম, তারা জীবনানন্দের গদ্যের মহিমা তখন অনুভব করতে পেরেছিলুম কিনা জানি না, তবে ১৯৫৬-৫৭-তে তাঁর গল্প প্রথম প্রকাশ করেছিলুম 'গ্রাম ও শহরের গল্প' ('অনুক্ত', কার্তিক-পৌষ ১৩৬২/১৯৫৬); 'ছায়ানট' ('অনুক্ত', বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬৩/১৯৫৬); 'বিলাস' ('অনুক্ত', কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩/১৯৫৭)। প্রসঙ্গত খবরটা এই যে, বর্তমান সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক তখন 'অনুক্ত' ত্রৈমাসিক পত্রের অন্যতর সহকারী সম্পাদক ছিল। সম্পাদক ছিলেন সুনীলকুমার নন্দী। আমরা জীবনানন্দের গদ্যরচনার প্রতি পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলুম; দৃষ্টি অবশ্য আকৃষ্ট হয় নি যতক্ষণ না 'মাল্যবান' উপন্যাসটি (যার প্রেসকপি তৈরি হয়েছিল

১৯৬৬তে, এবং প'ড়ে ছিল।) বেরোল ১৯৭৩ এ, অশোকানন্দের স্বপ্রয়াসে। তারও দশ বছরের বেশি সময় পরে দেবেশ রায়-এর কার্যকর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল জীবনানন্দের এই গুদামজাত গদ্যরচনাগুলির দিকে, এবং জীবনানন্দ অত্যন্ত উপকৃত হলেন।

যাই হোক, জাতীয় গ্রন্থাগারের বাইরে যে পাণ্ডুলিপির খাতাগুলি পিছনে প'ড়ে রইল, তাদের ভিতরে অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবনানন্দের কয়েকটি গল্পের এবং উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির খাতাও থেকে গিয়েছিল। তাঁর কাছে যে সব পাণ্ডুলিপির খাতা বা কাগজপত্র ছিল তার কিয়দংশ মঞ্জুশ্রী হারিয়ে ফেলেছেন (এবং কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।), কিয়দংশ তাঁর নাতিপরিচিত অল্পসম্পর্কিত আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন (তাঁর নিজের বাসাবাড়িতে স্থানাভাবের জন্য)। তাঁর মৃত্যুর পরে এই পাণ্ডুলিপিগুলি উদ্ধারের চেষ্টা হয়েছে, জীবনানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ তা মূলত করেছেন; কিছু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা গেছে, কিছু হয়তো যায় নি। হয়তো আরো পরিশ্রমী চেষ্টার দরকার আছে সেই পুনরুদ্ধারের কাজে। যা হোক, যে-পাণ্ডুলিপিগুলি এখন পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিতরে কয়েকটি 'সম্পূর্ণ' ও কয়েকটি 'অসম্পূর্ণ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি যেমন আছে, তেমন আছে কয়েকটি গল্পের। 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' ব'লে ধরা হচ্ছে তাদের, যাদের গল্পের গাঠনিক অবয়বে একটা সম্পূর্ণতার আভাস ছুঁয়ে ফেলা যায়, এবং যাদের লিখিত খাতাগুলি (তিন/চার/পাঁচ) ধারাবাহিত ভাবে ক্রমান্বয়ে পাওয়া যাচ্ছে; 'অসম্পূর্ণ' উপন্যাস বলা হচ্ছে তাদের (তারা হয়তো আসলে অসম্পূর্ণ ছিল না, এখন অসম্পূর্ণ হয়ে পড়েছে।) যাদের গল্পকাঠামো স্পষ্টতই অগঠিত, এবং যাদের লিখিত খাতার সংখ্যার বিবরণ এ-রকম: ১১: ২/৪/৫; ১/৩/৪ ইত্যাদি। স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, এই সব উপন্যাসের প্রত্যেকের কোনো-কোনো খাতা হারিয়েছে, যে-ভাবেই হোক। এই হারানো খাতাগুলি এক দিন হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, আশা করা যাক.।

সেই তথাকথিত 'অসম্পূর্ণ' উপন্যাস ক'টির একটি 'জীবনযাপন' নামে (নামকরণ আমাদের) প্রকাশিত হল; উপন্যাসটির ১-সংখ্যক খাতাটিই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।..."

শেষে, এই বইয়ের প্রকাশক হিসেবে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ সন্দীপ নায়কের জন্য যথেষ্ট নয়। যে ভালোবাসা থেকে উনি এই দায় মিটিয়েছেন, বাঙালি পাঠক চিরদিন তাঁকে মনে রাখবে।

উপন্যাসগুলিতে আধুনিক বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে; বিকল্প পাঠের ক্ষেত্রে আমরা জীবনানন্দ দাশের জীবৎকালে পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত পাঠের ক্ষেত্রে স্বয়ং লেখক যে রীতি অনুসরণ করেছেন তা গ্রহণ করেছি।

০৮.০১.২০২৬ গৌতম মিত্র

অজিত চায়ের কাপটা টেবিলে রাখতেই দরজা ঠেলে তারকবাবু ঢুকলেন—

অজিত বললে—বসুন, রাঙাখুড়ো—এই, রাজেন, চেয়ার দে—

রাজেনকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না, কোনও প্রয়োজনও ছিল না, অজিত নিজের হাতেই শশব্যস্তে চেয়ার টেনে নিয়ে বললে— বসুন— তারপর কী মনে করে, রাঙাখুড়ো—তামাক দেব?

—না, না, না, তামাকের কোনও দরকার নেই—দিলেও তোমার এখানে আমি খাব না তো

অজিত বিস্মিত হয়ে বললে—কেন, রাঙাখুড়ো—

—না—না—না—

অজিত ঘাড় হেঁট করে আধ মিনিট চুপ থেকে বললে—সব ভালো, রাঙাখুড়ো?

—সব ভালো—

তারকবাবু কোঁচানো চাদরের জোড় একবার ঘাড়ের থেকে উঠিয়ে আবার বিন্যস্ত করে নিয়ে বললেন— বড়ো আঘাত পেয়ে তোমার কাছে এসেছি, অজিত—

—আপনি আঘাত পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, অজিত

—কেন?

অজিত, তুমি শেষপর্যন্ত থিয়েটারে নামলে?

অজিত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হয়ে তারকবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

তারকবাবু বললেন—তোমার বাবার কথা কি তুমি একটুও মনে করোনি?

অজিত কোনও কথা বললে না।

—তোমার মা সেই ছেলেবেলা থেকে কত যত্ন করে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—

অজিত বললে—রাঙাখুড়ো—

তারকবাবু বাধা দিয়ে বললেন— তারপর বি. এ. পাশ করলে—এম. এ. পাশ করলে—

—হ্যাঁ

—তোমার চরিত্র তোমার বাপের মতো মর্যাদা পেল—অন্তত আমরা তাই ভেবেছিলাম— অনেক দিন অবধি ভেবেছিলাম কিন্তু তোমার যত অধঃপতন হোক না কেন—এ সব দিকে যে তুমি আসবে কোনওদিন, একথা তো আমরা কল্পনাও করতে পারি নি—

অজিত বললে—এসে পড়লাম

—এসে পড়লে? থিয়েটারে? মহিমের ছেলে হয়ে?

তারকবাবু বললেন—তোমাদের পরিবারকে আমি চিরজীবন ধরে এমন শ্রদ্ধা করে এসেছি, অজিত। এ পরিবার বামুন বা কায়েত বা কোনও সদ্বংশজাত হিন্দু পরিবার বলেই নয়— কিন্তু এর মনুষ্যত্বের জন্য। তোমার ঠাকুরদা আমার বন্ধু ছিলেন—তামাকটি অবধি ছুঁতেন না—কোনওদিন কোনও মজলিশ মুজরোয় তাঁকে দেখিনি— সংকীর্তন ছাড়া অন্য কোনও গান তাঁর অত্যন্ত উপেক্ষার জিনিস ছিল—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনওরকম প্রেমই তিনি কোনওদিন স্বীকার করতেন না। মেয়েমানুষের শরীরের কোনওরকম ব্যাখ্যাও কেউই কোনওদিন তাঁর কাছে করতে সাহস পেত না, পরস্ত্রীর দিকে তিনি ভুলেও কোনও দিন তাকাতে যেতেন না, অথচ উদার হৃদয়ের কত সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যশালী মানুষ— তোমার বাবাও তো ঠিক তারই মতো— সব বিষয়েই তোমার ঠাকুর্দার মতো।

একটু থেমে তারকবাবু বললেন— আমি ভেবে পাই না, তাঁদের বংশের সন্তান হয়ে তোমার বাপমায়ের হাতে চরিত্র গড়ে কী করে তোমার এরকম অবস্থা হল—

তারকবাবু হতভম্ব হয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে রইলেন

অজিত একটু হেসে বললে—এই কথা, রাঙাখুড়ো?

—কথাটা কি সামান্য, অজিত?

—আপনার কাছে নয়—

—থাক, তর্ক করব না, বড়ো দুঃখ পাই। তবুও এই কথাটুকু নিয়েও তোমার কাছে আসতাম না আমি যদি-না জানতাম তোমার ভেতর তোমার বাবার মতোই একটা চমৎকার মর্যাদা আছে—

—সে মর্যাদা আমি হারিয়ে ফেলিনি কি?

—চরিত্র খারাপ হলেও অনেক সময় তা হারায় না—

—হারায় না?

—না

—কিন্তু আমার চরিত্র খারাপ হয়েছে, একথা কেন বলেন?

—এসব দিকে এলে তা খারাপ হয়ই—

একথার কোনও জবাব না দিয়ে অজিত বললে— অনেক দিন আপনাদের নানা জনের সঙ্গে আমার দেখা নেই, খুড়ো— কিন্তু আপনারা সকলেই কি এই কথাই বলেন?